বিশেষ ক্রোড়পত্র

পিআরএসপি

দারিদ্র্য হ্রাসের অপকৌশলপত্র

দারিদ্র্য ও বাংলাদেশে উন্নয়নের বৈপরীত্য

ইমতিয়াজ এহসান

১. আলী হোসেনের বয়স এখন ৫২। অপুষ্টি আর ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তাকে দেখলে কে বলবে যে একসময় এই লোকটি ভ্যানগাড়ি চালাত। যৌবনের ঐ দিনগুলোয় প্রচন্ড পরিশ্রম করলেও পরিমিত আহার জোটেনি বেশিরভাগ সময়। স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পারেনি। এক মারাত্মক অসুখে সেই স্বাস্থ্য ভাঙল, তারপর আগের মতো উঠে দাঁড়াতে পারেনি সে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার অভাবে। বাধ্য হয়ে কম বেতনে কাজ নেয় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। ঝাড়া-মোছা, ঘর ধোয়া ও জিনিসপত্র টানার কাজ করে। তবে শরীরে পর্যাপ্ত শক্তি নেই বলে ভারী মালপত্র টানতে পারে না। বেতন-ভাতা সব মিলিয়ে মাসে পায় প্রায় ২,০০০ টাকা। তার বউও বাইরে কাজ করে। দু'জনে মিলে যা পায় তাতে ২ ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে সংসার চলে না। ১ মেয়ের বিয়ে দিলেও যৌতুক দিতে না পারায় অত্যাচার করে স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। দারিদ্র্য আর অপুষ্টি আলী হোসেনকে আরো দরিদ্র ও রুগ্ণ করে দিচ্ছে। বেঁচে থাকার কোনো মানে সে খুঁজে পায় না। তবু বাঁচার জন্য এই সংগ্রাম করছে।

২. পারভীন নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টসে কাজ করছে ছয় বছরের বেশি হলো। যে স্বপ্ন নিয়ে দূর গ্রামের উচ্ছল কিশোরীটি এক আত্মীয়ের হাত ধরে এসেছিল কাজে, আজ সেই স্বপ্নের রঙ অনেকটাই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে উচ্ছলতা। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ। মাঝে শুধু একঘন্টা বিরতি খাওয়া ও বিশ্রামের। বিশ্রাম হয় না তখনও। কারণ, খাওয়ার জন্য বাসায় ফিরে কোনোমতে দুটো ডালভাত মুখে গুঁজে আবার ছুটতে হয় গার্মেন্টসে। কখনো কখনো কাজের চাপ বেশি হলে নাইট করতে হয়। রাত ৮টায় ফিরে আবার ৯টায় যেতে হয়। ঘরে ফেরে রাত ১টা, কখনো ২টায়। পরদিন আবার সকালে ছুটতে হয়। অথচ ওভার টাইম দেয়া হয় ঘন্টায় ১০ টাকা। ২০০৩ সালের নবেম্বরে নারায়ণগঞ্জের বিসিকে শ্রমিক হত্যার পর প্রচন্ড শ্রমিক বিক্ষোভের কারণে দৈনিক কাজের সময়সীমা, ওভার টাইম, সাপ্তাহিক ছুটি এগুলোতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তারপরও শিপমেন্টের অজুহাতে শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটিও মেলে

না সবসময়। এতো পরিশ্রমের পরও মাস শেষে ঠিকমতো বেতন মেলে না প্রায়ই। ২/৩ মাসের বেতন বকেয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। ঈদের ঠিক আগের সন্ধ্যায় বা চাঁদ রাতে কাজ করিয়ে বেতন দেওয়া হয়। বোনাস বলে কিছু নাই। কারণ, ব্যবসার অবস্থা নাকি ভাল নয়। অথচ সারা রোজার মাস ধরে গার্মেন্টসের মালিক তার বউ, ছেলে-মেয়েসহ পরিবারের লোকজনের জন্য লাখ টাকা পর্যন্ত শপিং করে। মাসিক বেতন-ভাতা সব মিলিয়ে ২৫০০ টাকা। গ্রামে মা ও বোনকে টাকা পাঠাতে হয়। ভাল খাবার খেতে পারে না। শোষণ আর অপুষ্টির শিকার পারভীন ক্রমেই বেশি করে শোষিত হচ্ছে।

আজ থেকে দুই বছর আগে সাপ্তাহিক ২০০০-এ (সংখ্যা ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০২) আমরা আলী হোসেন এবং পারভীনের দারিদ্র্য পরিস্থিতির যে বর্ণনা দিয়েছিলাম, আজকে সেই অবস্থার উন্নতি তো হয়ইনি বরং অবনতি হয়েছে। অথচ এই দুই বছরে পারভীনরা যে গার্মেন্টসে কাজ করে, সেই গার্মেন্টস সম্প্রসারিত হয়েছে, ব্যবসা বেড়েছে, মালিকের গাড়ি আরো দামি হয়েছে, মালিকের স্ত্রীর শপিং বাজেটে রোজার মাসে কয়েক লাখ টাকায় উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য এবং উন্নয়নের বৈপরীত্য বুঝতে গেলে এরকম আরো লাখ লাখ পারভীন বা আলী হোসেনকে জানতে হবে। এরাই জানিয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশের গরিব মানুষ গরিব থেকে গরিবতরই হচ্ছে আর ধনীরা কেবলই ধনী হচ্ছে।

কিংবা ধরা যাক কলিমুদ্দিন, আল মোমিন, ময়না বা ইসহাক মিয়ার কথা। এদের প্রত্যেকের বাস দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে। বয়স ৪৫ থেকে ৫০। সম্পদ বলতে যা আছে তা হচ্ছে নিজের শরীর। কিন্তু মরা কার্তিকে নিজের গতর খাটিয়ে আহারটুকু জোগাড় হয় না তাদের। ইসহাক মিয়া যিনি লালমনিরহাটের চরাঞ্চলে বসবাস করেন নিজের অনাহারের কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'অনেক সময় এমন হয় দুই তিন দিন কোনো খাবার পাই না। এ সময়ে গাছের পাতা সেদ্ধ করে তার পরিবারের পেট চলে। কার্তিক মাসে সাধারণত একবেলা খেয়েই দিনগুজরান করতে হয় তার পরিবারকে। কার্তিকের মঙ্গা ছাড়াও বছরের অন্য সময়ও তার পরিবারের সকলের পেটে তিন বেলা ভাত জুটেছে খুব কমই।'

আসলে ইসহাক মিয়া ও তার পরিবারের পরিস্থিতি বাংলাদেশে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশে এ রকম প্রায় ২৫ লাখ পরিবার আছে যারা তিন বেলা পেট পুরে খেতে পায় না। সংখ্যায় তারা প্রায় দেড় কোটির উর্ধ্বে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এবং যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রনিক পোভার্টি গবেষণা কেন্দ্রের একটি যৌথ গবেষণা প্রতিবেদনে এই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'ক্রনিক পোভার্টি ইন বাংলাদেশ : দি স্টেট অব দি পোরেস্ট ২০০৪-০৫' শীর্ষক এ গবেষণায় বলা হয়েছে, বছরের পর বছর ধরে এসব মানুষের চরম দারিদ্র্যের জন্য

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির সংখ্যাতাত্ত্বিক চিত্র

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০০-এর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমীক্ষায় বলা হয়, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, জ্বালানি ইত্যাদি চাহিদার ন্যূনতম প্রয়োজন অপূর্ণতার ভিত্তিতে মাথা গণনা হিসাব পদ্ধতিতে দেশের ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে।

এতে উচ্চ দারিদ্র্যরেখা ব্যবহার করে দেখানো হয়, রাজশাহী বিভাগের ৬১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। খুলনা বিভাগে এই হার ৫১ দশমিক ৪ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৭ দশমিক ৭ শতাংশ, ঢাকা বিভাগে ৪৪ দশমিক ৮ শতাংশ। বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে কম ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ।

হিসাবে দেখা গেছে, মাসিক মাথাপিছু ব্যয়ের হিসাবে উচ্চ দারিদ্র্যরেখার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজশাহী বিভাগে মাথাপিছু খরচ ৪৯০ টাকা। অন্যদিকে মাসে সর্বোচ্চ খরচ হয় চট্টগ্রাম বিভাগে মাথাপিছু ৫৯৯ টাকা।

মাথা গণনা হিসাবে দেখা যায়, পরিবার আয়তন যত বড় সেখানে দারিদ্র্যও তত বেশি। ৭ থেকে ৮ সদস্যের পরিবারে দারিদ্র্য প্রবণতা সবচেয়ে বেশি, ৫৫ শতাংশের মতো। পক্ষান্তরে ১ থেকে ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ছোট পরিবারের দারিদ্র্য প্রবণতা কম, মাত্র ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ। অন্যদিকে দারিদ্র্য প্রবণতা ৫ থেকে ৬ জন নিয়ে গঠিত পরিবারে ৫২.৮ শতাংশ এবং ৩ থেকে ৪ জনের পরিবারে দারিদ্র্য প্রবণতা ৪৩ শতাংশ।

পেশা ভিত্তিক দারিদ্র্য প্রবণতায় দেখা গেছে, জাতীয় পর্যায়ে কৃষি, বন ও মৎস্য পেশাজীবীদের মধ্যে দারিদ্র্য প্রবণতা বেশি। পক্ষান্তরে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত পরিবারে দারিদ্র্য প্রবণতা সবচেয়ে কম। উচ্চ দারিদ্র্যরেখা ব্যবহার করে দেখা গেছে, সেবা কর্মীদের প্রায় ৫৫ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। উৎপাদন, পরিবহন ও এ সম্পর্কিত কাজে সংশ্লিষ্টদের ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। বিক্রয় কর্মীদের ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ, পেশাজীবী, কারিগরি ও সংশ্লিষ্ট পেশার মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য প্রবণতা সবচেয়ে কম, ৩২ দশমিক ৭ শতাংশ।

মানব দারিদ্র্য : দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০০৪ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। দক্ষিণ এশিয়ায় সবার ওপরে আছে মালদ্বীপ, যার অবস্থান ৮৪। তারপর শ্রীলংকা ৯৬তম, ভারত ১২৭তম, ভুটান ১৩৪তম, নেপাল ১৪০তম এবং সবার নিচে আছে পাকিস্তান ১৪২তম। পাকিস্তান ছাড়া এ অঞ্চলের বাকি দেশগুলো মধ্যম মানের শ্রেণীভুক্ত।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ গড় প্রত্যাশিত আয়ু, নারী শিক্ষার হার, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের মতো নির্দেশকগুলোতে কিছুটা এগিয়েছে। ২০০২ সালের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু উন্নীত হয়েছে ৬১ দশমিক ১ বছরে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ শিক্ষায় নারীদের সম্মিলিত অনুপ্রবেশের হার এখন ৫৪ শতাংশ, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা আছে ৪৮ শতাংশ মানুষের এবং ৯৭ শতাংশ মানুষ সুপেয় পানি পান করে। তবে বয়স্ক শিক্ষায় বাংলাদেশ এখনো দক্ষিণ এশিয়ার সবার নিচে। ২০০২ সালের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষের মাত্র শতকরা ৪১ দশমিক ১ ভাগের সাক্ষর জ্ঞান আছে। অথচ মালদ্বীপে এই হার ৯৭ দশমিক ২, শ্রীলংকায় ৯২ দশমিক ১, ভারতে ৬১ দশমিক ৩, ভুটানে ৪৭ শতাংশ, নেপালে ৪৪ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ।

মানব দারিদ্র্য সূচকে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৯৫টি উন্নয়নশীল দেশের বিবেচনায় গত বছরের মত এবারও বাংলাদেশের অবস্থান ৭২। আয় দারিদ্র্যের বিবেচনায়ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। ইউএনডিপি'র তথ্য অনুসারে, এখনো বাংলাদেশে ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। ৫ বছরের নিচে শিশুদের ৪৮ শতাংশেরই শারীরিক ওজন প্রত্যাশিত মানের চেয়ে কম।

মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও নিম্নআয়ের দেশের বিচারে ভালো নয়। ২০০২ সালের হিসাবে, বিশ্বের গড় মাথাপিছু জিডিপি ৫ হাজার ১৭৪ মার্কিন ডলার, দক্ষিণ এশিয়ায় এই গড় ৫১৬ ডলার এবং নিম্নআয়ের দেশে ৪৫১ ডলার। অথচ বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু জিডিপি মাত্র ৩৫১ মার্কিন ডলার। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মাথাপিছু জিডিপি- মালদ্বীপ ২ হাজার ১৮২ ডলার, শ্রীলংকা ৮৭৩ ডলার, ভুটান ৬৯৫ ডলার, ভারত ৪৮৭ ডলার, পাকিস্তান ৪০৮ ডলার এবং নেপাল ২৩০ ডলার।

সরকারের অবহেলা ও ব্যর্থতা এবং বাজার অর্থনীতি উভয়ই দায়ী। গবেষণার তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ২৪ শতাংশ অর্থাৎ ৩ কোটি মানুষ আয়ের ভিত্তিতে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এদের মধ্যে অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে দরিদ্র। এসব পরিবারের শিশুরা জন্ম থেকেই অপুষ্টির শিকার। তারপর কোনোরকম স্কুলে ভর্তি হলেও প্রাথমিক স্তর পার হওয়ার আগেই শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ে তারা।

শহরাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের তথ্যের নানা সাফল্য প্রচারিত হলেও ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই ৫ বছরে শহরবাসী মানুষের মধ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৭ দশমিক ২ ভাগ। আমাদের চারপাশ একটু পর্যবেক্ষণ করলেই ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তা থেকে শুরু করে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনসহ বিভিন্ন টার্মিনাল এলাকায় এরকম অসংখ্য ভাসমান দরিদ্র মানুষের রাত্রি যাপনের অনেক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। জীবন ধারণের ন্যূনতম আয়ও তারা করতে পারছে না। যারা বস্তিতে থাকে তাদের অবস্থাও করুণ। পরিবারে ৩ থেকে ৭ জন পর্যন্ত সদস্য আছে। এক ঘরের মধ্যেই সকলের বসবাস। আয়ের অর্ধেকটাই চলে যায় ঘর ভাড়া দিতে। বাকিটা দিয়ে কোনো রকমে সবগুলো পেট বাঁচিয়ে রাখা আর বছরের বছরের পর এভাবেই বেঁচে থাকা। অনুসন্ধানে জানা যায়, এদের অনেকেই গ্রাম থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে বেঁচে থাকার কারণে। নদী ভাঙন, গ্রামে কাজের সুযোগের অভাব এবং কৃষি শ্রমিকের উদ্বৃত্ত সরবরাহের কারণে ভূমিহীন এসব মানুষ শহরে আশ্রয় নিয়েছে। নগরের চলমান গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এরা কেউ কারখানার শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, রিকশাচালক, গৃহপরিচারিকা, হকার হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য থেকেও দেশের শহরাঞ্চলে এদের সংখ্যা যে দিনে দিনে বেড়ে চলছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাথা গণনা হিসেবে ২০০০ সালে সারা দেশের শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশই দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। অথচ ৫ বছর আগেও ১৯৯৫-৯৬ সালে শহরবাসী মানুষের মধ্যে ২৯ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করতো।

আয়ের বৈষম্য বেড়েই চলেছে

দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দাতা সংস্থার একের পর এক পরামর্শ ও সুপারিশ বাস্তবায়ন সত্ত্বেও একদিকে যেমন দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য আসছে না, অন্যদিকে দেশে আয় বৈষম্যও বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই দেশের অর্থনীতিবিদরা বলতে শুরু করেছে, ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি কে খাচ্ছে তাও নিশ্চিত হওয়া দরকার। যদি গরিবের কাছে প্রবৃদ্ধির সুফল না পৌঁছায় তাহলে এই প্রবৃদ্ধি দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন হবে না।

'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০০'-এর তথ্য অনুসারে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে দেশের সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ পরিবারের হিস্যা দেশের মোট আয়ে ছিল দশমিক ৮৮

‘কর্মসংস্থান ছাড়া দারিদ্র্য কমানো সম্ভব নয়’

প্রফেসর মোজাফফর আহমদ

সাপ্তাহিক ২০০০ : কেন আমাদেরকে পিআরএসপি করতে হচ্ছে?

প্রফেসর মোজাফফর আহমদ : দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র বা পিআরএসপি করার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘমেয়াদে বিদেশী সাহায্য পাওয়া নিশ্চিত করা। অথচ বাংলাদেশ আজকে যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে প্রথাগত সাহায্য প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। বরং আমাদের এখন অনেক বেশি প্রয়োজন প্রযুক্তির। অথচ প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি না সরকার, না দাতাগোষ্ঠী কেউই আমলে নিচ্ছে না। আবার আমরা যখন বিদেশী সাহায্য চাচ্ছি, তখন আমরা সঠিকভাবে অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করছি না। ফলে, ঋণ বা অনুদান আকারে সাহায্য যেটুকু আসছে, সেটুকুও অপব্যবহার হচ্ছে যা আবার আমাদের দায়-দেনা বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সাহায্যের সঙ্গে এমন সব শর্ত জুড়ে দিচ্ছে যা বহুলাংশে সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য অপ্রাসঙ্গিক। তারপরও পিআরএসপি করতে হচ্ছে, দাতা সংস্থাগুলো চাচ্ছে বলে।

২০০০ : দারিদ্র্য কমাতে হলে তাহলে কী কী কৌশল নেয়া প্রয়োজন?

মো. আ : দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। সরকার নিজে কোটি কোটি লোকের কর্মসংস্থান করে দেবে, এটা বাস্তবে সম্ভব নয়। সরকার প্রক্রিয়াটা সহজ ও গতিশীল করে দেবে। আমাদের দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করতে হলে দুটো কাজ খুব জরুরি। একটি হলো শ্রম-ঘন শিল্পায়ন, অন্যটি হলো শিক্ষা পাঠ্যক্রম সংস্কার। দুটোর কোনোটাই হচ্ছে না, হওয়ার কোনো প্রচেষ্টাও দেখা যাচ্ছে না। অপ্রিয় হলেও সত্যি যে আমাদের দেশে আসলে শিল্পায়ন হয়নি। গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই চলছে কেনা-বেচার বাণিজ্য, কোনোটি বৃহদাকারে, কোনোটি ক্ষুদ্রাকারে। ফলে শিল্পভিত্তি সম্প্রসারিত হয়নি, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। যেটুকু গড়ে উঠছিল সেগুলো আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। আমাদের হালকা প্রকৌশল শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে, আমাদের পাট শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। এর ফলে শ্রম-ঘন শিল্পখাত বিস্তার লাভ করেনি। বরং, পুঁজিঘন উদ্যোগের জন্য মুষ্টিমেয় মানুষ আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছে, হচ্ছে।

আবার শিক্ষাক্ষেত্রে যা ঘটছে, তা হলো জাতিকে বিভক্ত করার পাকাপাকি ব্যবস্থা। তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজ আজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত যেখানে একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনোই মিল নেই। এতে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বাড়ছে। শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর কথা বলা হয়েছে বহুবার। কোনো সরকার তাতে কান দেয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থা তো এমন হবার কথা যা জাতিকে একতাবদ্ধ রাখবে। পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মসংস্থানের জন্য পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা করতে হয় না। তারা তাদের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত খাতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কাজে ঢুকে পড়বে। আমাদের এখানে এটা হচ্ছে না, করারও কোনো চেষ্টা নেই। এসব দিক নিয়ে না ভাবলে, না দেখলে দারিদ্র্য কমবে তো নাই, বরং ধনী-গরীব বৈষম্য আরো বাড়বে।

২০০০ : বলা হয়, আমাদের টাকার সমস্যা নয়, টাকা আমরা খরচ করতে পারি না। প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যে কাটছাঁট করেও সম্পন্ন করা যায় না এটাই তার প্রমাণ। এটি কেন?

মো. আ : এডিপির ধারাটি পর্যালোচনা করলে এই প্রবণতাটি ফুটে ওঠে। এটি হচ্ছে ও হবে এ কারণেই যে পুরো উন্নয়ন ব্যয় ব্যবস্থাপনাটি অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত। স্থানীয় সরকারকে প্রয়োজন মতো টাকা খরচের অনুমতি দেয়া হয় না, এমনকি তাদের বরাদ্দও অনেক কম। আমাদের আমলারা ঢাকায় বসে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। উন্নয়ন ব্যয় পরিচালিত হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। মৌলভীবাজারে উন্নয়নের

শতাংশ। ২০০০ সালে তা আরো কমে দাঁড়ায় দশমিক ৬৭ শতাংশ। অন্যদিকে ১৯৯৫-৯৬ সালে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের আয় মোট জাতীয় আয়ের ২৩ দশমিক ৬২ শতাংশ। ২০০০ সালে তা আরো বেড়ে হয় ৩৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ। তবে আয় বৈষম্যের এই ঊর্ধ্বগতি গ্রামের তুলনায় শহরে বেশি। সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশের আয় ছিল মোট শহরবাসীর আয়ের দশমিক ৭৪ শতাংশ, যা ২০০০ সালে আরো কমে দশমিক ৬৩ শতাংশ হয়। অন্যদিকে ১৯৯৫-৯৬ শহরে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশের আয় ছিল মোট আয়ের ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০০০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ।

আয় দারিদ্র্যের প্রতিফলন মানব দারিদ্র্যেও আছে

আয় দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যর্থতা মানব দারিদ্র্য বিমোচনেও ফুটে উঠেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ২০০৪ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের মানব দারিদ্র্যের নানা পরিস্থিতি উঠে এসেছে। ইউএনডিপি প্রণীত সূচকে মধ্যম শ্রেণীভুক্ত বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১৭৭টি দেশের মধ্যে এবার ১৩৮। আগের বছর ২০০৩ সালে ১৭৫টি দেশের মধ্যে ছিল ১৩৯। আর ২০০২ সালে ১৭৩টি দেশের মধ্যে এই অবস্থান ছিল ১৪৫। তবে এখনো দক্ষিণ এশিয়ার সূচকের গড় মানের চেয়ে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাপনের মানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন সূচকের মানে দক্ষিণ এশিয়ার গড় দশমিক ৫৮৪ হলেও বাংলাদেশের সূচকের মান দশমিক ৫০৯।

দাতাদের ছাড়প্রত্র আর সুপারিশে এই পরিস্থিতি বদলাবে কি?

বিগত কয়েক বছরে দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যেসব প্রতিবেদন তৈরি করেছে, তাতে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। রাজনীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কিছু সমালোচনা থাকলেও বিগত এক দশকে গড়ে ৫ শতাংশ করে প্রবৃদ্ধি অর্জন, নির্বিঘ্নে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমান নির্ধারণে ভাসমান মুদ্রা ব্যবস্থা চালু, সুদের হার হ্রাস- এসব পদক্ষেপ প্রশংসিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বেসরকারিকরণ নিয়ে নানা অসন্তোষ থাকলেও আদমজী পাটকল বন্ধ করে দেওয়াকে স্বাগত জানিয়েছে সব দাতা সংস্থা। মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেই প্রবৃদ্ধিকে আরো বাড়ানো, বিদায়ী অর্থবছরে সাড়ে ৫ শতাংশের ঊর্ধ্বে প্রবৃদ্ধি অর্জন- এসব নানা বন্দনা রয়েছে তাদের প্রতিবেদনে। কিন্তু এতে খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই,

সরকার যদি সত্যি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর সংস্কারে ব্যাপারে আন্তরিক হয়, তাহলে ট্রেড ইউনিয়নের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে

নামে যথেচ্ছ অর্থ ঢালা হয়, অথচ লালমনিরহাট, গাইবান্ধায় মানুষ মঙ্গায় হাহাকার করলেও সেখানে টাকা যায় না। যেখানে নিচের দিকের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে অর্থ বরাদ্দ দেয়ার কথা, সেখানে উপর থেকে বরাদ্দ ঠিক করে দেয়া হয়। এই অবস্থা চললে গরিব মানুষ শুধু বঞ্চিতই হবে।

২০০০ : একদিকে পিআরএসপি করছি, অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফয়ের নির্দেশিত বিভিন্ন সংস্কার বাস্তবায়নে উঠে-পড়ে লাগছি। এটি কী বিপরীতমুখী আচরণ নয়?

মো. আ : যেসব সংস্কারে আমরা এখন হাত দিয়েছি, তার অনেকগুলো কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই দেশের মানুষের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। অথচ কোনো সরকার তা শোনেনি। এখন, বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ বলছে বলে করা হচ্ছে এবং তা আবার ঋণ-সাহায্য পাওয়ার জন্য। সমস্যা হলো, বিভিন্ন সংস্কারের জন্য দেশের ভেতর থেকে যেভাবে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, সেটি গ্রাহ্য না করে পুরোটাই হচ্ছে বিদেশী নির্দেশনা অনুসারে, দেশীয় আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপট অস্বীকার করে। অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক সংস্কারের জন্য লাখ লাখ ডলার দিয়ে বিদেশী কনসালটেন্ট আনতে হবে কেন? আমাদের বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলো যদি আমাদের দেশীয় লোকরা লাভজনকভাবে দক্ষতার সঙ্গে চালাতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো পারবে না, এটি সঠিক নয়। ইব্রাহিম খালেদ দক্ষতার সঙ্গে পূবালী ব্যাংক চালাচ্ছেন এবং এর অবস্থার উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। অথচ সোনালী ব্যাংক চালানোর সময় তা পেরে ওঠেননি। এর কারণ, রাজনৈতিক প্রভাব ও ট্রেড ইউনিয়নের দৌরাত্ম্য। সরকার যদি সত্যি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর সংস্কারে ব্যাপারে আন্তরিক হয়, তাহলে ট্রেড ইউনিয়নের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে, যথেচ্ছ রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে খেলাপি ঋণ বাড়ানোর প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে এসব ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে প্রতিযোগিতাশীল করতে হবে। এগুলো না করে শাখা গুটিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার যে পরিকল্পনা হয়েছে, তাতে কোনো সুফল আসবে না। একইভাবে লোকসান গুণছে বলে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়াও কোনো সমাধান নয়। এসব সংস্কারের ফলে পিআরএসপি বাস্তবায়নের পথটা কঠিন হয়ে যাবে, দরিদ্র্য মানুষের জন্য সেবার সুযোগ সীমিত হবে। **-আ. কি.**

নেই সুযোগও।

ভারতের বিজেপি সরকার উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ 'ভারত উদয়' নিয়ে নানা আত্মতুষ্টিতে ভুগলেও সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নির্বাচনে ভারতের দরিদ্র মানুষ রায় দিয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধি আর কথিত সংস্কারের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিগত কয়েক বছরে প্রতিবেশী দেশ ভারতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ শতাংশের উর্ধ্বে হলেও কৃষি প্রবৃদ্ধি ছিল খুবই কম। ২০০২-০৩ অর্থবছরে তা ছিল ঋণাত্মক। কৃষির এই বিপর্যস্ত অবস্থায় ভারতের আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে অনেক কৃষক দেনা শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ভারতের জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিজেপির পরাজয়ের পেছনে এটিকেও অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকি কৃষিকে অবহেলা করে হাইটেক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বহির্বিশ্বে খ্যাতি অর্জনকারী অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ও তার দল তেলেগু দেশম পার্টি চরম পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছে। তার মানেই হলো প্রবৃদ্ধির হার উচ্চ হলেই চলবে না, সেটি মানুষের কাছে ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে কি না তাও দেখতে হবে।

এসব অভিজ্ঞতাকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র তৈরি হচ্ছে। চলতি বছরের মধ্যেই এই দলিল চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে। আর এটির ওপর ভিত্তি করেই আগামী দিনে দেশ ও অর্থনীতি পরিচালিত হবে। কিন্তু কৌশলপত্র তৈরি ও তার নিজস্বতা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকেরই মত, দারিদ্র বিমোচনের প্রচন্ড তাগিদ থেকে নীতিনির্ধারকরা এই কৌশলপত্র তৈরি করছে না, বরং দাতাদের তুষ্ট করতে ও আগামীতে আরো ঋণ পেতে এতসব তৎপরতা। হয়তো বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে এসব তর্কবিতর্ক চলবে। নানা কৌশলপত্র তৈরি ও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হবে। কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণে প্রান্তজনের সক্রিয়তা ছাড়া অবস্থার পরিবর্তন হবে কি?

প্রবৃদ্ধিমুখী কৌশল ও বাস্তবতা

আসজাদুল কিবরিয়া

বাংলাদেশের মানুষের কাছে বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন সরকার এরকম একটা ধারণা দিতে চেয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারলেই সব কিছু অর্জিত হয়ে গেল। প্রবৃদ্ধি বেশি হলো না কম হলো এটা নিয়ে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল গত এক যুগ ধরে এতো বেশি হৈচৈ করেছে এবং এখনও করছে যে, মনে হয় জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারাটাই তাদের সাফল্যের মাপকাঠি হওয়া উচিত। এরা জনমনে বিশেষ করে সাধারণ জনগণের কাছে উন্নয়ন আর প্রবৃদ্ধিকে একই বিষয় বলে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। আর যখন যে দল ক্ষমতায় গিয়েছে এবং সরকারের দায়িত্ব পালন করেছে, তখনই তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হয়ে উঠেছে পূর্বসূরির শাসনামলে প্রবৃদ্ধি যে কম ছিল, তা প্রমাণ করা এবং প্রয়োজনে নিজের সময়ের প্রবৃদ্ধি বিভিন্ন সময়ে বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করা। জিডিপি (মোট জাতীয় উৎপাদন) প্রবৃদ্ধির যে দরকার আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রবৃদ্ধি হলেই উন্নয়ন হলো এমনটি ভাবার অবকাশ খুব কম। বরং প্রবৃদ্ধি কিভাবে হচ্ছে, এটি কোনদিকে যাচ্ছে, কিভাবে বন্টিত হচ্ছে এবং এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় আসলে কী প্রভাব পড়ছে- এসব বিশ্লেষণ না করলে প্রবৃদ্ধি একটি সংখ্যা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মজার বিষয়, প্রবৃদ্ধি নিয়ে আমাদের সরকার ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিভ্রমকে বেশ দক্ষতার সঙ্গেই কাজে লাগিয়েছে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। তার পরামর্শ মতো যে দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (পিআরএসপি) তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনকে দারিদ্র্য কমানোর প্রধান উপায় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোটা দাগে ধারণাটা এরকম যে, প্রবৃদ্ধি হলে কর্মসংস্থান হবে, কর্মসংস্থান হলে আয় হবে, আয় হলে দারিদ্র্য কমবে। ধারণাগতভাবে বিষয়টি ঠিক হলেও পথটি এতো সরলসোজা নয় মোটেও। বিশেষ করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো আজকে যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি তথা প্রবৃদ্ধি ধারা যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তাতে দারিদ্র্য কমার মূল লক্ষ্যটি অর্জন করা খুবই কঠিন হবে।

এক যুগ ধরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৪% থেকে ৬%-এর মধ্যে ওঠা-নামা করছে। এই সময়কালের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে, ৫.৯% হারে। অবশ্য এর আগের বছর অর্থনীতি নিম্নমুখী হয়ে পড়েছিল '৯৮-র ভয়াবহ বন্যার ফলে। সে কারণে বিপর্যস্ত অর্থনীতির তুলনায় পরের বছর অবস্থা কিছুটা ভালো হতেই প্রবৃদ্ধির হার এতোটা উপরে উঠে গেছে। চলতি বাজার মূল্যে জিডিপির হিসাব নিলে দেখা যায় যে ১৯৯৯-২০০০

'নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে পিআরএসপি তৈরি করতে হবে'

ড. আতিউর রহমান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস

সাপ্তাহিক ২০০০ : দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র যেভাবে তৈরি হচ্ছে, সে সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ কি?

আতিউর রহমান : আই-পিআরএসপি যখন তৈরি হয় তখন টোকেন কিছু পরামর্শ সভা করা হয়। এমনকি পরামর্শ সভার সুপারিশসমূহ দলিলে অন্তর্ভুক্ত হলো কি না তারও কোনো প্রমাণ পরে পাওয়া যায়নি। ফলে দাবি উঠেছিল ভবিষ্যতে যখন পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি তৈরি হবে, তখন যেন ব্যাপকমাত্রায় সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

২০০০ : বিভাগীয় পর্যায়ে ও জাতীয়ভাবে পরামর্শ সভা হয়েছে তো?

আ. র : নয় মাসে যেসব পরামর্শ সভা হয়েছে সেগুলো আয়োজনের দায়িত্ব ছিল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের ওপর। পরামর্শ সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে আমলাদের পছন্দের তালিকায় থাকতে হয়েছে। ফলে আয়োজকদের চরিত্রই প্রক্রিয়াটাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। নয় মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, গণমাধ্যমে এ সম্পর্কে আমরা কোনো প্রচারণা দেখিনি। তবে আমার উদ্বেগ হলো, সীমিত মাত্রায় যা আলোচনা হয়েছে সেগুলোরও প্রতিফলন মূল নীতিমালায় থাকবে কি না। আইপিআরএসপি'তে টোকেন পরামর্শ হলেও মূল দলিলে তার কোনো সংযোজন ছিল না। এবারেও সেরকম হলে সেটাকে বড় দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করব।

২০০০ : যে ১২টি থিমেটিক পেপার তৈরি হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কিছু জানতে

অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৯% যেখানে তার আগের বছর ১৯৮৮-৯৯ অর্থবছরে এই হার ছিল ৯.৭%। তবে অর্থনীতির প্রধান সূচক হিসেবে স্থায়ী মূল্যের হিসাবটি সর্বজনগৃহীত। আলোচ্য কালপর্বে সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৪.১% হারে, সেটা ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে। আর সর্বশেষ গত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৫.৫% হারে, যা আই-পিআরএসপি দলিলে বেঁধে দেয়া লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। আই-পিআরএসপি অনুসারে চলতি অর্থবছরে অবশ্য এই হার ৬%-এ উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। আর ২০০৫-০৬ থেকে ২০০৭-০৮ এই তিন অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৬.৫%-এ ধরে রাখার কথা বলা হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদে তথা ১৫ বছরে গড়ে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭%-এ উন্নীত করতে হবে যেটা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলসের (এমডিজিএস) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মজার বিষয় হলো, জাতিসংঘ প্রণীত এই 'এমডিজিএস' অর্জনের জন্য এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বেঁধে দেওয়া 'দারিদ্র্য কমানোয় অংশীদারমূলক চুক্তি (পিএআরপি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির কথা বেশ জোরেশোরেই উচ্চারিত হয়েছে আই-পিআরএসপিতে। পিআরএসপিতেও যে একই বিষয় বলা হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে এখানে আবার সে কথাই বলতে হচ্ছে যে, পিআরএসপি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দাতা নির্দেশিত পথেই এগোচ্ছে। এমডিজিএসে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনাসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকগুলোর উন্নতি ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। কারণ, এমডিজিএসে বিশ্ব থেকে চরম দারিদ্র্যসীমা মানে মাথাপিছু আয় দৈনিক ১ ডলারের নিচে এমন লোকের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে জন্য বলা হয়েছে। মূলত এটিই এমডিজিএসের প্রথম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আয় করার জন্য প্রধান কৌশল হিসেবে জোর দেয়া হয়েছে প্রবৃদ্ধি অর্জন করার ওপর। আর তাই ২০১৫ সাল পর্যন্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭%-এ স্থিতিশীল রাখতে হবে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি অনেক দিন ধরেই এই সুরে কথা বলছে। আর এখন তা আনুষ্ঠানিকভাবে পিআরএসপির মাধ্যমে বাংলাদেশকে বাধ্যবাধকতায় ফেলা হয়েছে।

ফলে পিআরএসপিতে আমাদের হিসাব কষে দেখাতে হচ্ছে যে ৭% প্রবৃদ্ধি ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাংক অবশ্য প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর তাগিদ দেওয়ার পাশাপাশি এও বলছে, 'শুধু প্রবৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়।' আর এটা তো সবারই জানা যে, শুধু প্রবৃদ্ধি দিয়ে সবকিছু সম্ভব নয়।

প্রবৃদ্ধি যখন মোক্ষলাভের প্রধান উপায়, তখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গঠন ও প্রবণতার দিকে আলোকপাত করা যাক। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণ করলে আমরা মোট তিনটি প্রধান খাত দেখতে পাই। এগুলো হলো : কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত। এক যুগের প্রবণতা থেকে আরো দেখতে পাই যে, জিডিপিতে কৃষির অবদান কমেছে, বেড়েছে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান। এর পাশাপাশি আরো যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধিতে শিল্প ও সেবা খাত কৃষির তুলনায় অনেক বেশি ভূমিকা রাখছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি আসলে শহরমুখী হয়ে পড়েছে। শহরমুখী হয়ে পড়ার ফলে প্রবৃদ্ধি বন্টনে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। তার মানে হলো প্রবৃদ্ধির সুফল সবাই সমানভাবে তো পাচ্ছেই না, বরং তা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে অল্প কিছু মানুষের হাতে। দেশের ব্যাংকিং খাতের দিকে তাকালে এর একটি ধারণা পাওয়া যায়। বর্তমানে শীর্ষ ১% অ্যাকাউন্ট হোল্ডার দেশের মোট ব্যাংকিং সম্পদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এর বিপরীতে ৯৫% অ্যাকাউন্ট হোল্ডার মাত্র ১৩.৫% ব্যাংকিং সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছে। এ

পেরেছেন কি?

আ. র : পত্রিকায় প্রকাশের কারণে কয়েকটি থিমেটিক পেপারের উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে কিছুটা অবগত হয়েছি। অধিকাংশ থিমেটিক পেপারই তৈরি করেছে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষকরা। তাদের কাজের প্রতি আমার আস্থা আছে। তবে কয়েকটি বিষয় থিমেটিক পেপারগুলোয় ভালোভাবে উঠে আসেনি বলে আমার মনে হয়েছে।

২০০০ : সেগুলোর কয়েকটি বলবেন কি?

আ. র : শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে যে বৈষম্য আছে সে সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই। স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি কিভাবে কমবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো সুপারিশ নেই। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আরো বেশি রাজস্ব আদায় বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে কিন্তু পরোক্ষ করের হাত থেকে গরিবদের কিভাবে রেহাই দেওয়া যায়, তা নিয়েও কোনো সুপারিশ নেই। কম্পিউটার প্রযুক্তি গ্রামগঞ্জে পৌঁছে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, সরকার সকল থানা পর্যায়ের হাইস্কুলে কম্পিউটার দিলেও তাতে ছাত্রদের খুব একটা উপকার হয়নি। ফলে কম্পিউটার দিয়ে কিভাবে জনবল তৈরি করা হবে বা গ্রামগঞ্জে কম্পিউটারের ফলাফল কি হবে সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।

২০০০ : দেশে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

আ. র : দেশের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের সকল পক্ষকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে আমাদের অনেক বদনাম আছে। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে আমাদের কিছু অর্জনও আছে। ক্ষুদ্রঋণ শিক্ষা নিতে আজকে উন্নত বিশ্ব আমাদের কাছে কারিগরি সহযোগিতা চাইছে। আমাদের গ্রামগঞ্জে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণে অনেক সংগঠন গড়ে উঠেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় এদের সম্পৃক্ত করতে হবে। আমার দেশের গরিব মানুষের একটা সৃজনশীল কর্মক্ষমতা আছে, তাকে কাজে লাগাতে হবে। আর তা না হলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয় মৃত্যু ঘটবে। আমি মনে করি, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র নিজেদের সাফল্যের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করতে হবে। না হলে এ দেশে কোনো কৌশলই কাজে লাগবে না। **-ই. এ.**

বিদেশী সাহায্য : বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রতারণা!

বিদেশী সাহায্য প্রসঙ্গে এখানে বলা দরকার। পিআরএসপি করার মাধ্যমে প্রতি বছর ২০০ কোটি ডলার বিদেশী সাহায্য পাওয়া যাবে- এমন ধারণাই জনগণকে দেয়া হচ্ছে সরকার এবং দাতাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, তিন বছরের জন্য আই-পিআরএসপি প্রণীত হলেও এর তিন বছরকালে ২১০ কেটি ডলারের মোট সাহায্য পাওয়া আসলে নির্ভর করছে আইএমএফের তিন বছর মেয়াদি পিআরজিএফ (পোভার্টি রিডাকশন গ্রোথ ফ্যাসিলিটি) কর্মসূচির এবং বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি এসিসটেন্স স্ট্র্যাটেজির (ক্যাস) আওতায় বিভিন্ন শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে সাহায্য প্রদান করবে যার মধ্যে শুধু অনুদানই নয় বরং ঋণও থাকছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। 'ক্যাস ২০০৩'-এর আওতায় ২০০৩-০৪ এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাংলাদেশকে কি পরিমাণ সাহায্য দেওয়া যেতে পারে তার একটি রূপরেখা দাঁড় করানো হয়েছে। ক্যাসের আওতায় বিভিন্ন শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে মধ্যমানে (বেস কেস) বাংলাদেশ এই দুই অর্থবছরে অন্তত ১২০ কোটি ডলারের বেশি সাহায্য পেতে পারে। এর মধ্যে চলতি ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জন্য ৪৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জন্য ৭৮ কোটি ডলার দেওয়া হবে। অন্যদিকে পিআরজিএফ কর্মসূচির আওতায়

২০০২-০৩ অর্থবছরে ৪৯ কোটি ডলার ঋণ সাহায্য এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৭৮ কোটি ডলার ঋণ সাহায্য অনুমোদন করেছে। তাহলে কি বিষয়টি এমন দাঁড়ায় না যে, সাহায্য প্রদানের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ আসলে এক ধরনের প্রতারণা করছে! -**আ. কি.**

তথ্য থেকেই বোঝা যায় যে, শহরমুখী প্রবৃদ্ধির ফলে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে শহরাঞ্চলে। গ্রাম থেকে শহরে সম্পদ প্রবাহের প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে। আজকে ঢাকা শহরের দিকে একটু তীক্ষ্ণভাবে তাকালে এ বিষয়টি বোঝা যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, আবাসন, বিপণন প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজধানীতে যে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ হচ্ছে তা রাজধানীর আশপাশে আধা-শহর এলাকাগুলোতেও হচ্ছে না। আমাদের নীতি-নির্ধারকরা যাই করুন না কেন, সব সময় রাজধানীকেন্দ্রিক চিন্তা করছেন। ঢাকা মানে যে সারা বাংলাদেশ নয়, এটি তারা ভুলতে বসেছেন। বরং ধারণাটা এমন যে, রাজধানীতে উন্নতি হলে তা আপনাআপনি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। বাস্তবতা হচ্ছে বিপরীত, তা বোঝা যায় সারা দেশ থেকে ঢাকামুখী মানুষের স্রোত দেখে। রাজধানীর উন্নতি হলে এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে লোকজন আর ঢাকায় ছুটত না, স্বল্প আয়ের মানুষ এসে মানবেতর জীবন যাপন করত না।

সুতরাং, চ্যালেঞ্জটা এখন ঐ প্রবৃদ্ধির সুষম বন্টনে, সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণে। প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে এতে কোনো দ্বিমত নেই। এরচেয়ে বড় কাজ হলো এই প্রবৃদ্ধির অর্জনকে জনসাধারণের মধ্যে সমভাব বন্টনের উদ্যোগ নিতে হবে। সমবন্টন মানে আবার এই নয় যে, সরকার দানছত্র খুলবে। বরং এমন প্রক্রিয়া করতে হবে, যেন আয়-সমতা সৃষ্টি হয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

পিআরএসপি দলিলের মূলে রয়েছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নির্দেশিত সামষ্টিক অর্থনীতির নীতি এজেন্ডা, যা কাঠামোগত সমন্বয় সংস্কার (এসএআর) কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকারগুলোর ওপর চাপিয়ে দিয়ে আসছে। প্রবৃদ্ধিমুখী কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হলেও এসএআর আসলে দারিদ্র্য হ্রাস ও সংস্কারের মধ্যে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এসএআরের মূল ধারণা হলো প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাস করে। কিন্তু এসএআরের আওতায় আমদানি উদারীকরণ, ভর্তুকি প্রত্যাহার, বেসরকারিকরণ বা আর্থিক খাত উন্মুক্তকরণের মতো পদক্ষেপগুলো কেন বা কিভাবে দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে তা বলা হয়নি। একই অবস্থা পিআরএসপিতে।

ফলে, প্রবৃদ্ধিমুখী কৌশল নিয়ে দারিদ্র্য হ্রাসের কথা বলা হলে প্রবৃদ্ধির বন্টন কিভাবে হবে এবং প্রবৃদ্ধিই বা কোন উপায়ে হবে, তা নির্ধারণ না করলে কাঙ্ক্ষিত ফল আসবে না।

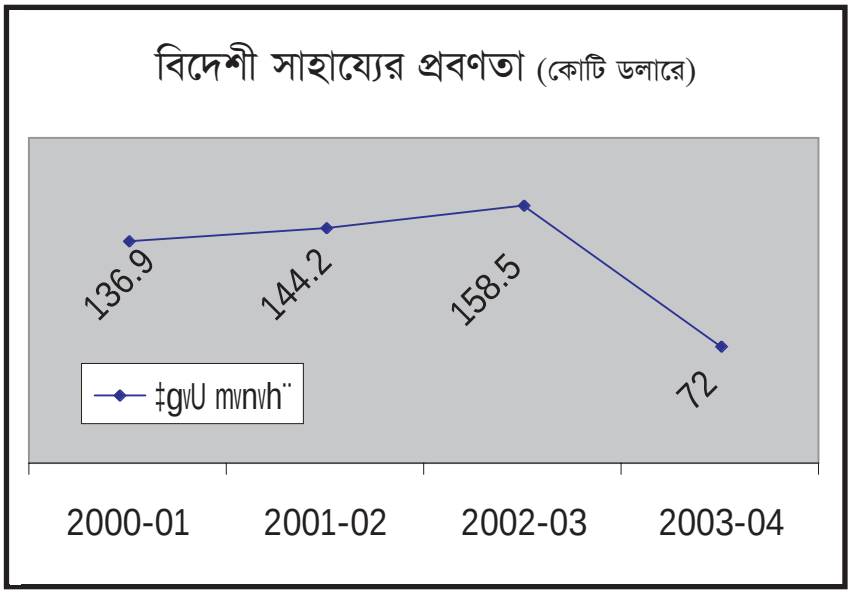

পিআরএসপি

প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

তানিম আসজাদ / ইমতিয়াজ এহসান

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ যৌথভাবে উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে যখন একটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, তখন ঐ কর্মসূচির আওতায় সাহায্যকামী দেশগুলোকে তাদের নিজেদের উদ্যোগে সবার অংশীদারিত্বে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়ন করার কথা বলা হয়। আরো বলা হয়, এই কৌশলপত্রের ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলো মানে দাতাগোষ্ঠী ঐসব দেশকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেবে। অবশ্য এই কৌশলপত্রের মূল বিষয় কি থাকবে তাও দাতাগোষ্ঠী বাতলে দেয়। এর মধ্যে বাজেট ঘাটতি কমিয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা, তিন বছরের জন্য মধ্য-মেয়াদি রাজস্ব ও উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি, অর্থনৈতিক কাঠামোগত সংস্কার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অর্থনীতিতে উদারীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরিতে জাতিসংঘের উদ্যোগে 'উন্নয়ন অর্থায়নের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে 'মন্টেরি ঐকমত্য' গৃহীত হয় যেখানে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলসের (Millennium Development Goals) সঙ্গে সবাই একাত্মতা ঘোষণা করে। সেখানে বলা হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলো স্বত্বাধিকারের ভিত্তিতে এবং নিজেদের উদ্যোগে যে দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি গ্রহণ করবে তা-ই উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ভিত্তি হবে। দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি জনগণের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হবে এবং তা গড়ে উঠবে মজবুত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে। এ ক্ষেত্রে আরও দরকার অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আইনের শাসন ও নারী-পুরুষের সমতা।

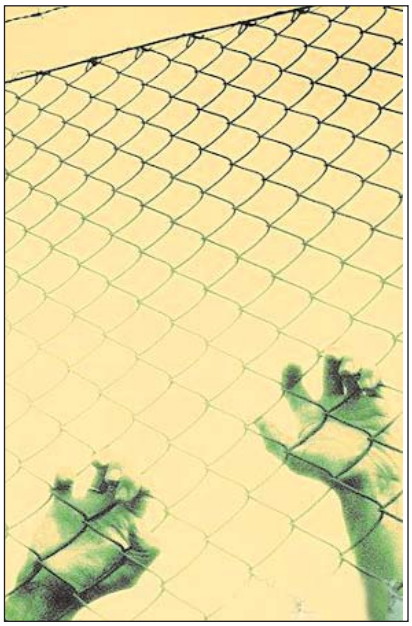

শর্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ইতিমধ্যে সরকার কিছু শর্ত বাস্তবায়ন করেছে এবং কিছু করার দিকে অগ্রসর হয়েছে। যেমন : বেসকারিকরণের অংশ হিসেবে রূপালী ব্যাংকে বিদেশী কনসালটেন্ট টিম কাজ শুরু করেছে, অগ্রণী ব্যাংকের টিমও কাজ শুরু করবে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাজেটে আমদানি শুল্কের সর্বোচ্চ হার কমিয়ে ২৫% করে ফেলা হয়েছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফকে খুশি করতে। সঞ্চয়পত্রের সুদের হার ছয় মাসের ব্যবধানে দু'দফায় গড়ে মোট ২% কমানো হয়েছে এবং আরেক দফা কমালেই ১০%-এর নিচে নেমে যাবে। চাল, গম, চিনিসহ ৫৫টি পণ্যের আমদানি ঋণপত্রের সীমা (এলসি মার্জিন) ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ থেকে সহজ শর্তে আর্থিক সাহায্য পেতে বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশও ২০০১ সালের অক্টোবর মাস থেকে তিন বছর মেয়াদি 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা' নামে খসড়া আই-পিআরএসপি প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ২০০২ সালের এপ্রিলে প্রাথমিক খসড়াটি সম্পন্ন হয়। এই খসড়ার ওপর একাধিক পর্যালোচনা-সমালোচনা ও মতামতের পর কিছু সংশোধন করা হয়। সংশোধিত খসড়াটি শেষ পর্যন্ত ২০০৩ সালের এপ্রিলে ঢাকায় বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামে দাতাগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করে।

শর্তের বেড়াজালে বাংলাদেশ

২০০৩-০৬ মেয়াদে মানে আই-পিআরএসপি বাস্তবায়নকালে বাংলাদেশকে একই সঙ্গে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের অনেকগুলো কঠিন শর্ত পালন করতে হচ্ছে ও হবে। এরকম কয়েকটি শর্ত হলো :

১. ১০৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা বা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া।

২. চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ১২৫টি শাখা গুটিয়ে ফেলা বা অন্য শাখার সঙ্গে একীভূত করা।

৩. ২০০৪ সালের মধ্যে, রূপালী, ২০০৬ সালের মধ্যে জনতা ও অগ্রণী এবং ২০০৭ সালের মধ্যে সোনালী ব্যাংক বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া।

৪. ২০০৫ সালের মধ্যে মোট আমানতে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের অংশ কমিয়ে ৪৫ শতাংশ করা।

৫. ২০০৪ সালের মধ্যে বৃহৎ করদাতার সংখ্যা ১ হাজারে উন্নীত করা এবং এজন্য কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান নিরীক্ষণ ও পরীবিক্ষণ সেল চালু করা।

৬. সরকারি ৬টি কর্পোরেশনের (বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন) আকার ছোট করে ১০ হাজার জনবল ছাঁটাই করা।

৭. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে চলতি লোকসানের পরিমাণ ৩৩৯ কোটি টাকা থেকে ৩০০ কোটি টাকায় নামিয়ে নিয়ে আসা।

৮. দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস ও তেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর খরচ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা এবং গ্যাস ও তেলের দাম ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে সমন্বয় করা, মানে এগুলোর দাম বাড়ানো।

৯. ২০০৫ সালের মধ্যে পুলিশ প্রশাসন সংস্কারে নতুন কৌশল ঘোষণা করা এবং বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ১০০ নতুন বিচারক নিয়োগ।

১০. ২০০৪ সালের মধ্যেই আমদানি শুল্কের সর্বোচ্চ হার ৩৭.৫% থেকে কমিয়ে ৩০% করা।

১১. সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমিয়ে ট্রেজারি বিলের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা এবং বাজারভিত্তিক করে তোলা।

‘বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সংস্কারে দরিদ্র মানুষের উপকার হয় না’

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ
অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : পিআরএসপি নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কি?

আনু মুহাম্মদ : পিআরএসপি’র জন্ম নিয়েই সমস্যা আছে। ১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বোর্ড মিটিংয়ে তাদের কার্যক্রমকে আরো সুসংগঠিত রূপ দিতে পিআরএসপি অনুমোদন করা হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে তাদের কার্যক্রমকে একটি অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা। তাদের প্রণীত কাঠামো অনুসারেই বিভিন্ন দেশের বাস্তবতাকে বিবেচনায় না নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশেও সেটাই হচ্ছে।

২০০০ : তাহলে কি আপনি বলতে চান পিআরএসপি বিশ্বব্যাংকের ফর্মুলা অনুসারেই তৈরি হচ্ছে?

আ. মু : বিশ্বের দেশে দেশে তাদের কাঠামোগত সমন্বয় কার্যক্রমের ব্যর্থতার কারণে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যে সমালোচনা ও প্রতিবাদ আন্দোলন বাড়তে থাকে, তার চাপেই বিশ্বব্যাংক তাদের কার্যক্রমকে নতুনরূপে আনার তাগিদ অনুভব করেছে। পিআরএসপি হচ্ছে এই কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির ওপর মিষ্টি প্রলেপ। আর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি তাদের আগের কার্যক্রমেরই ধারাবাহিকতা। পিআরএসপিতে কি থাকবে তার কঙ্কালটা তৈরি করেছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। তাতে শুধু বাংলাদেশের পরিস্থিতির কিছু পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি দেয়া হচ্ছে।

২০০০ : আই-পিআরএসপিতে দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে তো?

আ. মু : দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে যা জরুরি তা হচ্ছে গরিব মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা, তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। কিন্তু আই-পিআরএসপি দলিলে কর্মসংস্থানের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে করে দারিদ্র্য বিমোচন না হয়ে দেশে দারিদ্র্যের মাত্রা আরো বাড়বে।

২০০০: সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য নিয়েও তো অনেক পরামর্শ আছে?

আ. মু : সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য বলতে যে বাগাড়ম্বর চলছে সেগুলো আসলে অতিকথন ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলাদেশে শিল্পের

পিআরএসপি প্রণয়ন

এদিকে তিন বছর মেয়াদি আই-পিআরএসপি থেকে ১৫ বছর মেয়াদি পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি প্রণয়নের জন্য ২০০৩ সালের জুলাই মাসে জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে করা হয় এই ফোকাল পয়েন্ট। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) থেকে পিআরএসপির যাবতীয় কর্মকান্ড চলে আসে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে। ফলে পিআরএসপির মতো একটি অত্যন্ত জাতীয় দলিল প্রণয়নের কাজে দাতাগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ করার সুযোগ বহুলাংশে কমে আসে। ২০০৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকীর নেতৃত্বে পিআরএসপি সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির মোট সদস্য ২২ জন। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের (জিইডি) সদস্য ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ হন সদস্য সচিব। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি ঠিক করা হয় আই-পিআরএসপি’র বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং একটি পরিপূর্ণ পিআরএসপি প্রণয়ন তদারকি করা। পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি প্রণয়নের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ১২টি থিমেটিক গ্রুপ গঠন করে। থিমেটিক গ্রুপ ইতিমধ্যে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এর ভিত্তিতে এখন পিআরএসপির খসড়া তৈরির কাজ চলছে। কথা ছিল সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই খসড়া সম্পন্ন হবে। বাস্তবে হয়তো সেটি সম্ভব হবে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পিআরএসপি দলিল চূড়ান্ত হবে না। এটি ২০০৫ সালে গড়াবে।

আই-পিআরএসপির মতে পিআরএসপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা ও প্রশ্ন তোলার সুযোগ রয়েছে। আই-পিআরএসপি প্রণয়নের প্রাক্কালে দেশের নাগরিক সমাজ ও এনজিওরা যথেষ্ট হৈচৈ তুলেছিল, পত্র-পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হয়েছিল, পুরো বিষয়টা জনগণের সামনে তুলে আনার একটা জোর প্রচেষ্টা ছিল। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, আই-পিআরএসপি দলিল চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর এই জনসচেতনতা তৈরি করার প্রয়াসটাও থিতিয়ে যায়। এখন যখন পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি তৈরি হচ্ছে, তখন এর কনসালটেশন বা মতবিনিময় থেকে কোনো কিছু নিয়ে কারোরই যেন আর মাথাব্যথা নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর তো নেইই। আমরা সাপ্তাহিক ২০০০-এ ইতিমধ্যেই পিআরএসপি প্রণয়নের কয়েকটি দিক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি।

প্রথমত, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি যে কাজ করছে এবং এ পর্যন্ত কতখানি কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার মতো তেমন কোনো ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। ফলে, সেই স্বচ্ছতা ও জনসম্পৃক্ততার বিষয়টি আবারও সামনে চলে আসছে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি যদি প্রতিটি সভার পর সার্বিক কর্মকান্ডের একটি সারসংক্ষেপ অনতিবিলম্বে গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রকে অবহিত করে তাহলে এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে কর্মকান্ডের অগ্রগতি সম্পর্কে জেনে অনেকেই মতামত প্রদান করতে পারে। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যেসব বিষয়ের ওপর থিম পেপার তৈরি করা হয়েছে, সেসব বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে একাধিক গবেষণাপত্র দেশে রয়েছে, রয়েছেন বিভিন্ন গবেষক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, ট্যারিফ কমিশন বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কী কী কাজ করেছে ও করছে সেগুলো পর্যালোচনা করে থিমেটিক গ্রুপের প্রতিবেদনগুলো চূড়ান্ত করা হয়েছে কি না তা জানা যায়নি। এটি হলে বিষয়টি গুণগতভাবে অনেক উন্নততর হবে বলে আশা করা যায়। একই সঙ্গে এখন থিম পেপারগুলোর ওপর স্বতন্ত্রভাবে কর্মশালা করা হোক এবং কর্মশালার মতামতগুলোর আলোকে থিম পেপারগুলো সংশোধন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করা হোক।

তৃতীয়ত, যেহেতু পিআরএসপি হবে আমাদের নিজস্ব দলিল, সেহেতু দাতাগোষ্ঠীর যেকোনো ধরনের হস্তক্ষেপ এখানে অবাঞ্ছিত। অথচ আই-পিআরএসপিতে তাই ঘটেছিল। এবারও সেরকমটি ঘটার কিছু আশঙ্কা ঠিকই

ভিত্তি শক্তিশালী হয়নি। সেবা খাত বিকাশের নামে যা বলা হচ্ছে তারও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র নেই। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির নামে উচ্চফলনশীল বীজের যে চর্চা ছড়ানো হচ্ছে, তাতে দেশের কৃষক, পরিবেশ ও মাটির ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা উদ্বেগ শুরু হয়েছে।

২০০০ : সংস্কার করে নানা দক্ষতা বৃদ্ধির কথা আসছে পিআরএসপিতে

আ. মু : তথাকথিত সংস্কারের নামে যে ধরনের সুপারিশ ও পরামর্শ এসেছে, তার আসল চরিত্র হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে আরো সংকুচিত করা। আর্থিক খাত সংস্কারের নামে যা চলছে তাতে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রাম পর্যায়ে যে শাখা আছে তা গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে। আইএমএফের ঋণ নিয়ে যে আত্মঘাতী সংস্কারের পথে হাঁটছে সরকার, তাতে দেশের আর্থিক খাতে অস্থিরতা আরো বাড়বে। রাজস্ব সংস্কারের ব্যাপারে নানা বাগাড়ম্বর চলছে। কিন্তু সাধারণ মানুষকেই বেশি বেশি কর দিতে হচ্ছে আর বিত্তবানদের কর আরো মওকুফ করা হচ্ছে। পানিসম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য নিরাপত্তার নামে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তাতে দেশে জলাবদ্ধতা আরো বেড়েছে এবং খাদ্যদ্রব্যেরও আমদানি দিনে দিনে বাড়ছে।

২০০০ : তাহলে কি পিআরএসপি দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য আসবে না বলে আপনি মনে করেন?

আ. মু : আই-পিআরএসপি দলিলের মধ্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে, তাতে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন হবে না বরং দারিদ্র্য পুনঃউৎপাদন হবে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও ঋণ নিয়ে দেশে আর যাই হোক, দরিদ্র মানুষের উপকার হয় না তা প্রমাণের ভূরি ভূরি দলিল আছে। নিজেদের কাজ ও কর্মসূচি সম্পর্কে চরম আস্থাহীনতার কারণেই আজকে তাদের দায়মুক্তির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে হচ্ছে। **-ই. এ.**

পিআরএসপি দলিলটির খসড়া সংসদে তোলা হোক এবং সংসদীয় আলোচনার ভিত্তিতে দলিলটি চূড়ান্ত করা হোক

দেখা দিচ্ছে। আর্থিক খাত সংস্কারের ব্যাংকিং অংশটির থিম পেপার তৈরি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়, যেখানে কার্যত বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নির্দেশনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

চতুর্থত, বিভাগীয় পর্যায়ে যে ছয়টি কনসালটেশন হয়েছে। খসড়া দলিলটি তৈরির পর সেটির ওপর আরো একদফা কনসালটেশন করা উচিত। সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো, খসড়া দলিলটি নিয়ে জাতীয় সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করা। সংসদে অনেক আজেবাজে কথাবার্তা বলে, অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় নষ্ট করা হয়। সেটি না করে পিআরএসপি দলিলটির খসড়া সংসদে তোলা হোক এবং সংসদীয় আলোচনার ভিত্তিতে দলিলটি চূড়ান্ত করা হোক।

বাস্তবায়ন করার চ্যালেঞ্জ

পিআরএসপি দলিল তৈরি হওয়াটাই বড় কথা নয়। ভালো দলিল বা ভালো কৌশল প্রণয়ন করে সেটি বাস্তবায়ন করা না গেলে কার্যত একটি অর্থহীন দলিল ছাড়া অন্য কিছু পাওয়ার থাকবে না। ইতিমধ্যে প্রণীত আই-পিআরএসপির আওতায় প্রথম বছর সম্পন্ন হয়েছে এবং কিছু সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা গেছে, কিছু যায়নি। আরো একটি বছর না গেলে আসলে বাস্তবায়নের সাফল্য-ব্যর্থতা বলা যাবে না। তবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এটি বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারের হাতে মূল হাতিয়ার হলো জাতীয় বাজেট। বাজেটের মধ্যে উন্নয়ন বাজেট বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পিআরএসপি প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত পরিকল্পনা কমিশন পর্যন্ত বলেছে যে শেষ পর্যন্ত পিআরএসপি'র সাফল্য নির্ভর করছে বাজেট বিশেষ করে এডিপি বাস্তবায়নের ওপর।

কিন্তু গত কয়েক বছরে এডিপি বাস্তবায়নের যে ধারা তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব নয় মোটেও। বরং এখন প্রশ্ন উঠছে যে, এই উন্নয়ন বরাদ্দ খরচ করার বা এডিপি ঠিকমতো বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য সরকারের আছে কি না। এডিপি বাস্তবায়নের দৈন্যদশা তুলে ধরে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বলছে, প্রকৃত পক্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ী টাকা খরচ করার সামর্থ্য দেশের উন্নয়ন প্রশাসনের নেই। গত ২০০৩-০৪ অর্থবছরের কথাই ধরা যাক, যখন উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছিল ২০ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে তা সংশোধন করে ১৯ হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু অর্থবছরের ৯ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেখা গেল, খরচ হয়েছে মাত্র ৯ হাজার ১৮৯ কোটি টাকা। তার মানে তিন মাসে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে আরো প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ করার কথা, যা বাস্তবে সম্ভব নয়। বরং এতে লুটপাট ও অপচয়ের পথ প্রশস্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সিপিডি চলতি অর্থবছরের ২২ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন ব্যয় বাস্তবায়ন নিয়েও একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সিপিডির মতে, পরিকল্পনা অনুমোদনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা প্রণয়নের এককেন্দ্রিক পদ্ধতি ও রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে সরকারি আমলাদের কাজে ঢিলেমি- এসব অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া কখনই বড় মাপের উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

আশার কথা, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এজন্য অর্থবছরের প্রথম থেকেই তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে দ্রুততার সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য তাগাদা দিয়েছেন। তিনি এই বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন যে উন্নয়ন কাজে ঢিলেমি করলে বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হবে। এজন্য তিনি উন্নয়ন ব্যয় নিয়মিত তদারকি ও পর্যালোচনার কথাও বলেছেন। একই সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো বন্যার কারণে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। পিআরএসপিকে সামনে রেখে অর্থমন্ত্রীর এই উদ্যোগ আমাদের উন্নয়ন ব্যয়কে সঠিকভাবে পরিচালিত করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করা যেতেই পারে।

তবে আরেকটি বিষয় আছে, সেদিকেও বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া দরকার। সেটি হলো, এডিপি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণ হিসেবে অজুহাত দেয়া হয় অর্থ প্রাপ্তির সমস্যাকে। এখনও সরকারের তরফ থেকে এরকম ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয় যে, ঠিকমতো বিদেশী সাহায্য বা দেশীয় অর্থ পওয়া যাচ্ছে না বলে কাজ হচ্ছে না। বাস্তবতা কিন্তু বলে ভিন্ন কথা। এই মুহূর্তে দেশের ব্যাংকগুলোতে সব মিলিয়ে আট হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ বিনিয়োগহীন অবস্থায় অলস টাকা হিসেবে পড়ে আছে। সিপিডি হিসাব করে দেখিয়েছে, বছরে প্রায় ৭০ কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য অবমুক্ত করা যাচ্ছে না। আবার বছর বছর এডিপির কয়েক হাজার কোটি টাকা ফেরত যাচ্ছে ব্যয় করতে না পারার কারণে। তার মানে, টাকা কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হলো সঠিকভাবে, সময়মতো, প্রয়োজনীয় খাতে খরচ করতে না পারা।

বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এর প্রভাব ও এনজিওদের কর্মতৎপরতা

মৌসুমী মহাপাত্র

গত দুই দশকে অবকাঠামোগত সংস্কারের বিষয়টি পৃথিবীজুড়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রবেশ করেছে। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দরিদ্র মানুষের আবাস এশিয়াও কাঠামোগত সমন্বয় নীতির (Structural Adjustment Policies বা SAP) আওতার বাইরে নয়। '৮০-র দশক থেকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলো অবকাঠামো সংস্কার কর্মকৌশল বাস্তবায়নে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রাক-সংস্কার উন্নয়ন গতি সংস্কার-পরবর্তী উন্নয়ন গতির চেয়ে বেশি ছিল। পাকিস্তানেও সংস্কারকালীন দারিদ্র্য বিমোচন পরিস্থিতি খুব একটা সুখকর নয়। যা আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিমালার (IFI Policy) ব্যর্থতারই প্রতিফলন।

দারিদ্র্য বিমোচনে আইএফআই (বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ)-এর ব্যর্থতা সত্ত্বেও তারা পিআরএসপি (PRSP) প্রণয়ন করাচ্ছে। এতে অংশগ্রহণ, মালিকানা এবং স্বচ্ছতার মতো বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে। তবে বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিতে 'অংশগ্রহণের' ধারণাটি ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে যেন দারিদ্র্য বিমোচনের গালভরা বুলির আড়ালে জনমত হারিয়ে যায়। অথচ পিআরএসপি অনুযায়ী, জাতীয় দারিদ্র্য হ্রাস নীতিমালা নির্ধারিত হবে জনমতের ভিত্তিতে।

অদ্যাবধি পিআরএসপিতে জনমত নয়, স্বয়ং জনগণকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আইএফআই'র সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নতির বেদবাক্য হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে, বিতর্কের বিষয় হিসেবে নয়। ফলে দারিদ্র্যের আবরণে পরিবর্তন এসেছে, কাঠামোয় নয়। উপরন্তু, প্রদত্ত সুপারিশে তথ্য-উপাত্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়নি। সুপারিশে অনেক বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পেশাগত কিংবা আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর বিন্যাস কেমন হবে কিংবা

রাজনীতিবিদের অনীহা

পিআরএসপি নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে আমরা সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম। যোগাযোগ করেছিলাম সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মন্ত্রী ও আমলাদের সঙ্গে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে তাঁরা কেউই কথা বলতে চাননি। এমনকি পিআরএসপি দলিলটি জাতীয় সংসদে উঠবে কি না সে বিষয়েও সরকারের কোনো ভাষ্য পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকেও পিআরএসপি নিয়ে জোরালো কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার উৎসাহ উদ্যোগ দেখা যায়নি।

কাজী জাফর উল্লাহ
সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ের প্রাথমিক কাজ আওয়ামী লীগ আমলে শুরু হয়েছে। এ সময় থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত দাতাগোষ্ঠীর পিআরএসপি সংক্রান্ত আলোচনা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমিও ছিলাম। জোট সরকার দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের মতো বিষয় প্রণয়নের পূর্বে এ জোট সরকার সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা করেনি। এমনকি বিরোধী দলের আলোচনার উদ্যোগ নিয়ে সৌজন্যতাবোধও দেখায়নি। আমি মনে করি সরকার ভুল করেছে। সরকারের জানা উচিত যে কোনো অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নয়। অর্থনৈতিক কর্মসূচি সফল করার জন্য রাজনৈতিক সফলতা একান্ত প্রয়োজন। বিরোধী দলের রাজনৈতিক সহযোগিতা পিআরএসপি'র ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন ছিল। অপরদিকে দাতা সংস্থা পিআরএসপি বিষয়ে শুধু সরকারের কাছে আলোচনা করে ভুল করেছে। দাতা সংস্থারও বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
সাধারণ সম্পাদক, সিপিবি

দেশে দারিদ্র্য সৃষ্টির এক হাজার একটি কারণ রয়েছে। এসব কারণ অনুসন্ধান করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। একটি পিআরএসপি করে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে না। আমি যতটুকু জেনেছি, পিআরএসপিতে বন্ধ কলকারখানা খুলে দেয়ার কোনো উদ্যোগ নেই। অপরদিকে ব্যাংক সুদ কমিয়ে ধনীকে আরো ঋণ নেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। পিআরএসপি করে আরো দারিদ্র্যই সৃষ্টি করা হবে।

জি.এম. কাদের
সংসদ সদস্য, জাতীয় পার্টি

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়। আমি পয়েন্ট অব অর্ডারে সংসদে পিআরএসপি নিয়ে যাতে আলোচনা হয়, তার দাবি করেছিলাম। সরকার এ দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। রাষ্ট্রের সকল মৌলিক বিষয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। পিআরএসপি নিয়ে সংসদে আলোচনা না করে সরকার কার্যত সংবিধানকে লঙ্ঘন করেছে।

RqŠ AvPvh

সময় পিছিয়ে গেলো

- 30 †m‡Þ¤‡ii g‡a¨ wcAviGmwci Lmov n‡”Q bv
- bZb Lvbv Avq-e¨q Rwic n‡e AvMvgx eQi

A_gšx Gg mvBdi ingvb

পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি দলিলটির খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করার কথা ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর '০৪ মধ্যে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এই সময়ের মধ্যে খসড়া তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন নতুন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০ অক্টোবর '০৪। এ প্রসঙ্গে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান জানিয়েছেন যে কিছু অসম্পূর্ণতার কারণে খসড়া তৈরি করার কাজটি পিছিয়ে দিতে হয়েছে। তবে তিনি জোর আশাবাদী যে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত দলিল তৈরি করা যাবে। তবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মনে করছে, খসড়া তৈরির সময়সীমা পিছিয়ে যাওয়ায় এবার চূড়ান্ত করার সময়টাও পিছিয়ে যেতে পারে।

এদিকে যে দারিদ্র্য নিয়ে এতো কথা, এতো কাজ, সেই দারিদ্র্যের কোনো হালনাগাদ সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই। সরকারিভাবে যে পরিসংখ্যান আমরা পাই এবং যা সবাইকেই ব্যবহার করতে হচ্ছে তাদের প্রয়োজনে, সেটার মেয়াদ ২০০০ সাল পর্যন্ত। মানে ২০০০ সালের পর দেশের সার্বিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির কোনো তথ্য-উপাত্ত, পরিসংখ্যান নেই কোনো ক্ষেত্রে। ফলে গত ৩-৪ বছরে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির কতখানি উন্নতি বা অবনতি হয়েছে, আর বৈষম্য কতোটা কমেছে বা বেড়েছে সে সম্বন্ধে কোনো সঠিক ধারণা করা যাচ্ছে না। যেটুকু ধারণা করা যায় বা চিত্র পাওয়া যায় তা নির্ণয় করা হচ্ছে জিডিপি প্রবৃদ্ধির গঠন কাঠামো এবং মানব উন্নয়ন সূচকের সর্বশেষ তথ্য পরিসংখ্যান দেখে। তার মানে, একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে আমরা দারিদ্র্য নিয়ে যেসব কাজ করছি, তা করছি দারিদ্র্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট না জেনে। এমনকি আমরা সঠিকভাবে জানতেও পারছি না, যেসব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে সেগুলো কতখানি ও কিভাবে কাজে দিচ্ছে কিংবা আদৌ কাজে আসছে কি না।

তবে দারিদ্র্যবিষয়ক সর্বশেষ যে পরিসংখ্যান আমরা ব্যবহার করছি, সেটি একাধিক কারণেই উদ্বেগজনক। বিশেষ করে ঐ পরিসংখ্যান থেকে আয়বৈষম্যের বা অসমতার যে চিত্র পাওয়া যায় তা একটি বৈষম্যমূলক সমাজ কাঠামোকেই তুলে ধরে। ২০০০ সালে সম্পন্ন হওয়া 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ' (HIES 2000)-ই এখন পর্যন্ত দারিদ্র্য অবস্থা ও আয়-বৈষম্যের পরিসংখ্যান দেয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিসি) অবশ্য ২০০৪ সালের আরেকটি জরিপের কাজ করছে বলে জানা গেছে। কিন্তু তার কোনো তথ্য পরিসংখ্যানই মেলেনি। ফলে গত ৩-৪ বছরের দারিদ্র্যাবস্থা বিশেষত আই-পিআরএসপি দলিলের বাস্তবায়ন আরম্ভ করার পর প্রথম বছরের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা জানার কোনো উপায় নেই। ফলে, পুরোনো তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়েই এখন চলছে কাজ।

হালনাগাদ তথ্যের প্রয়োজনীয়তা থেকে পরিকল্পনা কমিশন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে নতুন জরিপ সম্পন্ন করার জন্য বলেছে। পরিসংখ্যান ব্যুরো সেপ্টেম্বর মাসেই এই জরিপ কাজ আরম্ভ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বন্যার কারণে এখন এই কাজও পিছিয়ে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, এই জরিপ আগামী বছরের প্রথমদিকে সম্পন্ন করা হবে। কারণ বন্যার ফলে লাখ লাখ লোক গৃহহারা হয়ে পড়ায় এখন তাদের ওপর জরিপ চালিয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে না বলে মনে করা হচ্ছে। বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন সম্পন্ন হলে জরিপ চালিয়ে তুলনামূলকভাবে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। এটি হবে 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০০৫'। -শ.র.

কোন পলিসিটি বেশি কার্যকর হবে বলে জনগণ মনে করে- এগুলো আমলে নেয়া হয়নি। 'একটা কিছু হলেই চলবে' ধাঁচের পরামর্শে জনমতের সঠিক প্রতিফলন যেমন নেই, তেমনি আছে প্রচুর অপব্যাখ্যা।

সুবিধার মতৈক্য

'ওয়াশিংটন মতৈক্য' শব্দগুচ্ছের উদ্ভাবক জন উইলিয়ামসন সে সময় ঠিক ছিলেন। কেননা, এটি ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে ওয়াশিংটন এবং আইএফআই'গুলোর ঐকমত্য। উন্নয়নশীল বিশ্বের ঐকমত্য এটি ছিল না। 'ওয়াশিংটন মতৈক্য' প্রণীত হয়েছিল আসলে ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের বিপুল দেনা হ্রাসের উদ্দেশ্যে। পরে সব উন্নয়নশীল দেশের 'সর্বরোগের মহৌষধ' হিসেবে একে চাপিয়ে দেয়াটা ছিল একটা মস্তবড় ভুল। এই ভুলের মাশুল দিচ্ছে স্বপ্নোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কোটি কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

SAP-এর ব্যর্থতার সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছে 'অবকাঠামো সংস্কার অংশীদার মূল্যায়ন' বা SAPRI-এর 'গ্লোবাল স্টিয়ারিং কমিটি'। এতে বলা হয়েছে, SAP-এর পরামর্শ মোতাবেক উন্নতির চিত্র মিশ্র। বিপুল ফারাক সৃষ্টি হয়েছে আয়-বন্টনে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে। পারিশ্রমিকও হ্রাস পেয়েছে। SAP-এর পরামর্শ মোতাবেক সংস্কারের ফলে লাভ হয়েছে সুবিধাভোগী এবং বৃহৎ উৎপাদকদের।

SAPRI-তে অংশগ্রহণকারী এশিয়ার একমাত্র দেশ বাংলাদেশ। SAP গ্রহণকারী প্রথম ৩৫টি দেশের একটি হিসেবে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সমর্থিত কর্মপন্থা নিয়ে বাংলাদেশ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ বিষয়ক SAPRI রিপোর্টে বলা হয়েছে, দারিদ্র্য নিরসন হয়েছে সামান্যই। বাস্তবতা হলো, সংস্কার কর্মসূচির আগে ১৯৭৪-৮২ সময়কালে দারিদ্র্য কমেছে ১.২৯ শতাংশ হারে। পক্ষান্তরে সংস্কার-উত্তর ১৯৮৪-৯৬ সময়কালে এই হার কমে এসেছে ০.৯২ শতাংশে।

পিআরএসপি ও এনজিওদের কর্মতৎপরতা

২০০৩ সালের মার্চে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশলপত্র সম্পন্ন করে। এটি আই-পিআরএসপি (I-PRSP) নামে সুপরিচিত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের (এমডিজি) ভিত্তিতে এ জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৩ সালের ৩০ জুন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের 'কান্ট্রি অ্যাসিসটেন্স স্ট্রাটেজি'র

‘প্রবৃদ্ধিমুখী কৌশল বৈষম্য বাড়াবে’

ড. নাসরিন খন্দকার
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : পিআরএসপি প্রণয়নকে জনগণের অংশীদারিত্বমূলক ও নিজস্ব বলা হচ্ছে। আসলে তা কতোটুকু?

ড. নাসরিন খন্দকার : পিআরএসপি প্রণয়ন করার পুরো প্রক্রিয়াটি তো নির্দিষ্ট কিছু ছকে বাধা গৎ অনুসারে করা হচ্ছে বা করতে হচ্ছে। ছয়টি বিভাগীয় সদরে পৃথক ছয়টি কনসালটেশন হয়েছে। এই কনসালটেশনগুলোকে কতখানি অংশীদারিত্বমূলক বলা যাবে সেটা বলাও মুশকিল। সবচেয়ে বড় কথা, সার্বিক নীতি পরিকল্পনাই তো পূর্ব-নির্ধারিত।

২০০০ : পিআরএসপিতে প্রবৃদ্ধিকে দারিদ্র্য হ্রাসের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

না.খ : শুধু প্রবৃদ্ধিমুখী কৌশল কার্যত বৈষম্যকেই সবসময় উৎসাহিত করে থাকে। দেশের কর্মসংস্থানের বর্তমান অবস্থাটি বিবেচনায় নিলে এটি আরো বেশি সত্যি। কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না করলে শুধু প্রবৃদ্ধি কোনো কাজে আসবে না। প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে আবার বিভিন্ন সংস্কার করা হচ্ছে অর্থনীতিকে বাজারমুখী, বাণিজ্য উদার ও ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক করার জন্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সব বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে যা আয় বৈষম্যকেই বাড়াচ্ছে।

২০০০ : তাহলে একদিকে আমরা পিআরএসপি করছি, অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফয়ের নির্দেশিত বিভিন্ন সংস্কার বাস্তবায়নে উঠে-পড়ে লাগছি। এর ফল কী হবে?

না.খ : এসব সংস্কার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করলেও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে। সংস্কারের ফলে কল-

---

মূল্যায়নপত্রের ওপর একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। এতে এমডিজি বা উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয়। এতে আরো বলা হয়, ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি সম্পন্ন হবার পর একটি নতুন সহায়তা কৌশলপত্র বা CAS চূড়ান্ত করা হবে।

অবশ্য ২০০৩ সালের জুনে প্রদত্ত CAS রিপোর্টে কিছু বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে ঋণ দেয়া হতে পারে। এই বিষয়গুলোর মধ্যে আছে মতৈক্যে পৌঁছা ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক বাজেট কাঠামোর সন্তোষজনক বাস্তবায়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিবিধ ক্ষেত্রে নীতিগত সংস্কার, আর্থিক পরিচালনা, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং SOE-র পুনর্গঠন, জ্বালানি এবং টেলিযোগাযোগ। শর্তগুলো দেয়া হয়েছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে; দেশজ কৌশল কিংবা নিদেনপক্ষে মিলেনিয়াম গোলের ভিত্তিতে নয়।

মিলেনিয়াম লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক আর কোনো ঋণ কিংবা বরাদ্দ দেবে না। বরং ভবিষ্যৎ সাহায্য নির্ভর করবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে তাদের বেঁধে দেয়া শর্ত মেনে চলার ওপর। যেমন- সামান্য বাজেট ঘাটতি রাখলে কিংবা দুর্নীতি দমনবিষয়ক সংস্কার বাস্তবায়ন সাপেক্ষে বাংলাদেশ ঋণ সাহায্য পেতে পারে।

অবশ্য অগ্রগতি বিষয়ক রিপোর্টে বলা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি বাস্তবায়নের পথে অব্যাহত সন্তোষজনক অগ্রগতি ভবিষ্যৎ সাহায্য প্রাপ্তির নির্ধারক। অর্থাৎ সংস্কার কর্মসূচির ফলাফল নয়, এর বাস্তবায়নই হচ্ছে সাহায্য প্রাপ্তির ভিত্তি। অতএব, দাতা সংস্থাগুলো কাকে কী পরিমাণ অর্থ দেবে এই সিদ্ধান্তে দারিদ্র্য দূরীকরণের বিষয়টি সামান্য ভূমিকা রাখবে।

২০০০ সালের এপ্রিলে প্যারিস কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশ সরকারকে কংগ্রেসের ঋণ পাওয়ার জন্য পিআরএসপি জমা দিতে বলে। এ জন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয় ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই নির্দেশের পরপরই রুদ্ধদ্বার একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যা বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ মোটেই অনুমান করতে পারেনি। পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১১ জন সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। কিভাবে অগ্রসর হতে হবে তা আলোচনার জন্য ধারাবাহিক বৈঠক বসে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে এবার অবশ্য ইউএনডিপির খয়রাতের জন্য পীড়াপীড়িতেই সময় কেটে যায়। এভাবে ২০০১-এর অক্টোবর নাগাদ পরামর্শদান প্রক্রিয়া সত্যিকার অর্থে শুরু হয়। এ সময় পিআরএসপি প্রক্রিয়া দেখভালের জন্য দু'জন বাংলাদেশী পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। ব্র্যাককেও এ কাজে সম্পৃক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন ফোরামের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের ফলাফল জানাজানি হবার পর দেশের সুশীল সমাজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। জাতীয় পর্যায়ের এনজিওদের সমন্বয়ে একটি গ্রুপ গঠিত হয়। এতে 'অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ'ও যোগ দেয়। কিন্তু গ্রুপটির শ্লথগতির যৌথ সাড়া এবং স্থানীয় সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত না করার কারণে 'অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ' বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র কর্মসূচি গ্রহণ করে।

'অ্যাকশন এইড বাংলাদেশে'র পিআরএসপি বিষয়ক কর্মসূচি আসলে কৌশলগত পদক্ষেপ। উদ্দেশ্য, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।

বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ নিয়ন্ত্রিত পিআরএসপি'র বিপক্ষে যুক্ত থেকে সক্রিয়ভাবে প্রচারণার ফলে দারিদ্র্য নিরসনে সরকার পরিচালিত দেশীয় কর্মকৌশলের জন্য পথ পরিষ্কার হবে। তাছাড়া এর ফলে 'পিআরএসপি' ছাড়াও সরকার এবং দাতা সংস্থাগুলোর ওপর চাপ বাড়বে।

২০০১ সালে আন্দোলনের সূত্রপাত। সরকারের নেতৃত্বাধীন সুপারিশ কার্যক্রম প্রক্রিয়ার ওপর নজর দেয়া হয়। পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্টের (PET) সঙ্গে যৌথভাবে AAB (Action Aid Bangladesh) সমান্তরাল মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। পাঁচটি বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, স্থানীয় এনজিও, তৃণমূল প্রতিনিধিসহ সুশীল সমাজের গণ্যমান্যরা। বাংলাদেশে পিআরএসপি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি দারিদ্র্যের রকমফের এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিই ছিল এসব মতবিনিময়ের উদ্দেশ্য। এসব বিভাগীয় মতবিনিময় কার্যক্রম জাতীয় নীতিনির্ধারক প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকা মানুষের বক্তব্যের সুযোগ করে দেয়। আঞ্চলিক কর্মশালার পর AAB ও PET

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সব বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে যা আয় বৈষম্যকেই বাড়াচ্ছে

কারখানা বন্ধ হচ্ছে। এতে বেকারত্ব বাড়ছে ও বাড়বে। কার্যত এসব সংস্কার কর্মসংস্থানকে সমর্থন যোগায় না, শিল্পখাতে তো নয়ই। বরং, সমাজে নতুন করে গরিব তৈরি করছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোও সংস্কারে নামে শাখা গুটাচ্ছে যাতে গ্রামের গরিব মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে সংস্কারের ফলে লাভবান হচ্ছে সমাজের ধনী শ্রেণী এবং স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় কিছু লোক যেমন ঠিকাদার ও আমদানিকারক। এরা সবাই শুল্ক হ্রাসের সুযোগ নিয়ে লাভবান হচ্ছে।

২০০০ : তাহলে সংস্কারের বিকল্প কী হবে?

না.খ : সংস্কার যেভাবে করা হচ্ছে সেটি অবশ্যই পর্যালোচনার প্রয়োজন, প্রয়োজন এর সামাজিক ব্যয় ও সমন্বয় ব্যয় পর্যালোচনা করার। কারণ, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ নির্দেশিত পথে সংস্কারে শেষ পর্যন্ত সুফল আসবে না। সরকারের উচিত হবে, বাজারে হস্তক্ষেপ করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখার যেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গরিব ও সাধারণ মানুষের কষ্টের কারণ না হয়। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীন বাজারের কুফল আমরা টের পাচ্ছি। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে, অপরাধ ও দুর্নীতি বাড়ছে, সর্বোপরি সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে। **-আ. কি.**

মিলেনিয়াম লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক আর কোনো ঋণ কিংবা বরাদ্দ দেবে না। বরং ভবিষ্যৎ সাহায্য নির্ভর করবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে তাদের বেঁধে দেয়া শর্ত মেনে চলার ওপর। যেমন- সামান্য বাজেট ঘাটতি রাখলে কিংবা দুর্নীতি দমনবিষয়ক সংস্কার বাস্তবায়ন সাপেক্ষে বাংলাদেশ ঋণ সাহায্য পেতে পারে

যৌথভাবে জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে এসব সুপারিশ জানাতে এবং পিআরএসপি বিষয়ে নিজের অবস্থান জানাতে। বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ, কর্মী এবং এনজিও এই সম্মেলনে অংশ নেয়। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সম্মেলনটির ব্যাপক কাভারেজের ফলে দেশবাসী পিআরএসপি'র গুরুত্ব বুঝতে পারে। আসলে প্রিন্ট মিডিয়া প্রত্যেকটি বিভাগীয় পরামর্শ কর্মশালা কাভার করায় স্বচ্ছ সুপারিশ কার্যক্রমের বিষয়টি নজরে আসে, যার ঘাটতি ছিল জাতীয় পিআরএসপি উপদেষ্টা পর্ষদে।

জাতীয় সম্মেলনে 'অ্যাকশন এইড বাংলাদেশে'র (এএবি) ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। এতে খোলাখুলিভাবে বাংলাদেশে পিআরএসপি তৈরির সময়সীমা বাড়ানোর দাবি জানানো হয়। বিশ্বব্যাংক নয়, জনমতের প্রতিফলন ঘটবে এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশীদারী কৌশলপত্র তৈরির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এ ছাড়া বিকল্প কৌশলবিষয়ক আন্তরিক ও স্বচ্ছ বিতর্কের জন্যও অতিরিক্ত সময় চাওয়া হয়।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ঘোষণাপত্রে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রতি সাহায্য প্রাপ্তির শর্ত হিসেবে ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে পিআরএসপি প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। এএবি পিআরএসপি নীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি প্রণয়নের দিকনির্দেশনা হিসেবে সেপ্টেম্বরের সময়সীমাকে ব্যবহারের পরামর্শ দেয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে এএবি'র ৩০টিরও বেশি সহযোগী সংগঠনকে নিয়ে পত্র সংগ্রহ অভিযান পরিচালিত হয়। তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানানো এবং সময়সীমা বাড়ানোর দাবির প্রতি সমর্থন জোগাড় ছিল অভিযানের লক্ষ্য। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রায় ৩০ হাজার চিঠি পাঠানো হয়।

অর্থনৈতিক উন্নতি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রের (আই-পিআরএসপি) প্রথম খসড়া প্রকাশিত হবার পর সময়সীমা বাড়ানো হয় ২০০৩ সালের মার্চ পর্যন্ত। একটি পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত দু'বছর বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পরামর্শ কার্যক্রমের জন্য একটি পথনির্দেশিকাও দেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের এই প্রাপ্তি এএবি'কে পিআরএসপি বিষয়ক আন্দোলন চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে।

সময়সীমা বৃদ্ধির পর এএবি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় কৌশলপত্রের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে কাজ শুরু করে। নিম্নোক্ত ধারাসমূহ বেছে নেয়া হয়, যার ভিত্তিতে চলমান পিআরএসপি আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে।

* স্বচ্ছ এবং উন্মুক্ত পরামর্শ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের পরামর্শ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

* বিষয়সূচিকে প্রভাবিত করা, যেন খসড়া পিআরএসপিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র এবং স্থানীয় পর্যায়ের বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়। (এ পর্যন্ত জাতিগত এবং জাতীয় সংখ্যালঘু, কৃষি শ্রমিক, রাজনীতিক এবং স্থানীয় পর্যায়ের সুশীল সমাজের বক্তব্যকে পরামর্শে তুলে ধরা হয়েছে)।

* বর্তমান ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিকল্প কাঠামোর প্রস্তাব।

* বিভিন্ন পন্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মতামতকে তুলে ধরা।

* পিআরএসপি'র ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে সিএসও, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক প্রমুখের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক জোট গঠন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের পিআরএসপি'র আংশিক তুলনায় নীতি, কৌশল এবং ব্যাষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে দারুণ মিল লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর আরো অবনতি ঘটেছে দারিদ্র্য দূরীকরণের কোনো সত্যিকার কৌশল না থাকায়। এএবি এবং স্থানীয় ও জাতীয় অন্যান্য এনজিও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে, আই-পিআরএসপিতে দরিদ্রতার আঞ্চলিক দিকগুলো উপেক্ষার পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, কৃষি শ্রমিক, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বিষয়গুলো সামনে আনতে এএবি স্থানীয় সহযোগীদের সঙ্গে পুনরায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করে। উপজাতীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, শিক্ষাবিদ, কৃষি শ্রমিক, রাজনীতিক, শ্রমিক সংঘসমূহের সঙ্গে একাধিকবার মতবিনিময় করা হয়।

†µvocÎwU mvßvwnK 2000 Ges A¨vKkbGBW evsjv‡`‡ki GKwU th$_ D‡`¨vM